

স্টোরিজ ফ্রম সুনানু আবি দাউদ

ফেটা রিজ ফ্রম

সুনানু আবি দাউদ হাদিসের গল্প-৩

মাওলানা সাবেত চৌধুরী

ফাজেলে দারুল উলূম দেওবন্দ
ও জামিয়া শারইয়্যাহ মালিবাগ

সম্পাদনা

মিশকাত আহমদ

লেখক ও সম্পাদক

প্রকাশনায়:

ক্বাতেবিন

ইসলামী টাওয়ার ২য় তলা, দোকান নং-২২

বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

০১৯৭৬৫৯৯৩২৪, ০১৬৭৬৫৯৯৩২৪

স্টোরিজ ফ্রম সুনানু আবি দাউদ

বিশিষ্ট সাহিত্যিক, জামিয়া শারইয়্যাহ মালিবাগের মুহাদ্দিস
হজরত মাওলানা নাসীম আরাফাত দা. বা.-এর

দুআ ও অভিমত

নবী-সাহাবিদের যুগ পৃথিবীর ইতিহাসের এক শ্রেষ্ঠতম অধ্যায়। এ অধ্যায় আলোকিত, দীপাঙ্কিত। এ অধ্যায় অনুসরণীয়, অনুকরণীয়। তাই এ অধ্যায়কে বলা হয় খাইরুল কুরুন—শ্রেষ্ঠতম যুগ।

এ অধ্যায়ের প্রতিটি মানুষ স্মরণীয়, বরণীয়, অনুকরণীয়, অনুসরণীয়। প্রতিটি মানুষ হিদায়াতের মিনার, আঁধারের বুকে আলো। এঁরা হীরকখণ্ড, পরশপাথর। এঁদের জীবনের প্রতিটি কাহিনি প্রতিটি গল্প, আমাদের পরকালের পাথেয়, হিদায়াতের অমূল্য সামান, নিকষ অন্ধকারে আলোর স্ফুরণ।

কিশোরদের নির্মল অন্তরে গল্পের প্রভাব অনেক বেশি। তাই শিশু-কিশোরদের নিয়ে অনেক অমূল্য সাহিত্য-সম্ভার রয়েছে সব ভাষায় সব জাতির মাঝে—যুগ থেকে যুগান্তর।

স্টোরিজ ফ্রম সুনানু আবি দাউদ বইটিতে স্নেহের সাবেত চৌধুরী হাদিসের গল্পভাষ্য, অনুবাদ ও সংকলন করেছে। সুনানু আবি দাউদের যে হাদিসগুলো তাকে বেশ মুগ্ধ করেছিল সেগুলো থেকে অনুপ্রাণিত হয়ে গল্পগুলো তৈরি করেছে। এবারের গল্পগুলোতে রয়েছে কল্পনার রঙ, তবে প্রতিটি গল্পেই একটি হাদিসকে সে এমনভাবে গেঁথেছে, যেন তা শিশুমনের আঙিনায় চিরসবুজ হয়ে থাকে। আমাদের শিশু-কিশোরদের অঙ্গনে এ ধরনের গ্রন্থের খুব বেশি প্রয়োজন। তাই সাবেত চৌধুরীর জন্য রইল দুআ ও শুভকামনা।

মনমোহিনী, হৃদয়স্পর্শী লেখার জন্য অনেক অধ্যবসায়ের প্রয়োজন। দীর্ঘ সাধনার দরকার। উপস্থাপনার কলাকৌশল অর্জনে আরও মেহনত দরকার। চিন্তা ও কল্পনাশক্তি আরও শানিত করা দরকার। তাই লিখতে হবে। পড়তে হবে। চিরায়ত সাহিত্যের গ্রন্থ পড়তে হবে। লেখার চেয়ে বেশি পড়তে হবে। তা হলেই সফলতা ললাটচুম্বন করবে।

বইটি পড়েছি। গল্পগুলো ভালো লেগেছে। এক মলাটে অনেকগুলো গল্প, অনেকগুলো কাহিনি। আশা করি, অনাগত প্রজন্মের জীবন সাজাতে তা বিস্ময়কর প্রভাব ফেলবে। চরিত্রকে ফুলেল করতে তা এক ধাপ এগিয়ে থাকবে। বইটির বহুল প্রচার কামনা করছি।

একিঞ্চি হাসান

৪০৩/এ, খিলগাঁও চৌরাস্তা, ঢাকা-১২১৯

১. প্রতিটি মানুষ বলতে এখানে সাহাবিগণ উদ্দেশ্য।

লেখকের কলাম

গল্পের প্রতি মানুষের ভালোবাসা স্বভাবজাত। গল্প, হ্যাঁ... আমরা কমবেশি সবাই গল্প করতে, বলতে, পড়তে ভালোবাসি। বিশেষ করে উঠতি বয়সের তরুণ-কিশোরদের গল্পের প্রতি ঝোঁক-আগ্রহ। গল্প হলো মনে মনে একটা কাহিনি বানানো বা প্লট তৈরি করা। সেটা সত্যও হতে পারে, আবার কল্পকাহিনিও হতে পারে। আধুনিক কালের গল্পগুলোতে সুন্দর কোনো আদর্শে পাঠককে উজ্জীবিত করার ব্যগ্রতা থাকে না। সমাজ বিনিমাণে এসব গল্পগুলোই ভূমিকা রাখে।

ফলে পৃথিবী একটা নিকষকালো আঁধারের দিকে দ্রুত ধাবমান। সমাজে তারাই আজ প্রতিষ্ঠিত শক্তিশালী লেখক। সমাজের অলি-গলি, অন্দর-বাহির দখল করে রেখেছে। এসব প্রতিরোধে চাই সুশীল সাহিত্যের ধারা সৃষ্টি করা। বিদ্রোহ আর বিদ্রোহ। কলমের বিদ্রোহ! সকালের সেই সুবহি মক্তব, মাইকে ছাত্র-ছাত্রীদের ডাকা শহরে নেই। গ্রামেও কমে যাচ্ছে দিনদিন। শিল্প-সাহিত্যের বিপ্লবের সময় এগুলো বড়ই বেমানান!

এই সিরিজের প্রথম দুটি বই—*স্টোরিজ ফ্রম সহিহ বুখারি* এবং *স্টোরিজ ফ্রম সহিহ মুসলিম*—ছিল সরাসরি হাদিসভিত্তিক গল্পের ভান্ডার। কিন্তু এই তৃতীয় খণ্ডটি—*স্টোরিজ ফ্রম সুনানু আবু দাউদ*—একটি ভিন্ন অভিজ্ঞতা। এখানে হাদিসের আলোকে গড়া হয়েছে সমকালীন, প্রাণবন্ত ও হৃদয়ছোঁয়া গল্প, যা শিশুমন সহজেই গ্রহণ করতে পারবে।

শিক্ষণীয় ও দিক-নির্দেশনায় পূর্ণ এ গল্পগুলো তরুণ-কিশোরদের যেমন সুন্দরের পথ দেখাবে, তেমনই যেকোনো বয়সি পাঠকের মনে দাগ ফেলবে, নিজেদের সমৃদ্ধ ও সুন্দর জীবন গঠনের পাথেয় জোগাবে। এ পথে সামনে এগোতে খোদায়ি তাওফিক কামনা করছি।

আশা করি নবীজির কথাগুলো আমাদের মনে হেদায়েতের উষ্মান্ধ আলোরূপে প্রতিভাত হবে, আমরা আলোকিত মানুষ হব, আলোকিত জ্ঞানী হব—সেই প্রত্যাশায়।

আমরা শতভাগ চেষ্টা করেছি নির্ভুল করে ছাপতে। বিজ্ঞ পাঠক! এরপরও কোথাও ভুল থেকে যেতে পারে। দৃষ্টিগোচর হলে আমাদের জানিয়ে বাধিত করবেন। পরবর্তী মুদ্রণে আমরা সংশোধন করে নেব। ইনশাআল্লাহ।

আল্লাহ আমাদের সবাইকে দ্বীনের দায়ি হিসেবে কবুল করুন। আমিন।

সাবেত চৌধুরী
২৫/০৬/২০২৫ খ্রি.

সম্পাদকীয়

আলহামদুলিল্লাহ।

স্টোরিজ ফ্রম সুনানু আবি দাউদ—শিশু-কিশোরদের জন্য একটি ব্যতিক্রমধর্মী গল্পগ্রন্থ। এই বই সম্পাদনার দায়িত্ব পেয়ে আমি নিজের জন্য এটিকে একটি সৌভাগ্য ও নেক নিয়ামত মনে করি।

প্রিয় লেখক সাবেত চৌধুরী ভাই অত্যন্ত দরদ, মমতা ও খালেস নিয়তে যে গল্পগুলো লিখেছেন—তাঁর লেখাগুলো শুধু গল্প নয়, বরং ছোটোদের হৃদয়ে ইসলামের আলো পৌঁছে দেওয়ার একটি সুন্দর প্রচেষ্টা।

এই গ্রন্থের প্রতিটি গল্প শিশুর মনে আখলাক, সবর, দয়া, নামাজের গুরুত্ব এবং একজন উত্তম মুমিন হয়ে ওঠার প্রেরণা জাগাবে ইনশাআল্লাহ। গল্পগুলোতে সুনানু আবি দাউদ থেকে প্রাসঙ্গিক হাদিস বা ইসলামিক ব্যাখ্যা যোগ করে পাঠকদের জন্য বিষয়বস্তু আরও বিশ্বাসযোগ্য এবং হৃদয়স্পর্শী করে তোলা হয়েছে। যাতে পাঠক গল্পের গভীরে ইসলামের সুঘ্রাণ অনুভব করতে পারে।

সম্পাদনার সময় আমি সচেতনভাবে খেয়াল রেখেছি—

গল্পের ভাষা যেন শিশু ও কিশোরদের উপযোগী হয় এবং গল্পের উপস্থাপনাও যেন ঝরঝরে ও প্রাণবন্ত হয়। গভীর ইসলামি শিক্ষা যেন আনন্দদায়ক উপায়ে ছোটোদের হৃদয়ে পৌঁছে যায়।

আমার কামনা, এই গল্পগুলো শিশুদের শুধু আনন্দই দেবে না, বরং তাদের চোখে অশ্রু আনবে, হাসাবে, ভাবাবে; আর সবশেষে তাদেরকে ভালো মানুষ হওয়ার দিকে এক কদম এগিয়ে দেবে।

এই বইটি শুধু একটি গল্পের সংকলন নয়, বরং আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে অপসংস্কৃতির আধার থেকে আলোর পথে এগিয়ে নেওয়ার একটি বিনয়ী প্রচেষ্টা।

পরিশেষে, যিনি লিখেছেন, যিনি প্রকাশ করেছেন, এবং যিনি বইটি হাতে তুলে নিয়েছেন—তিনজনেরই প্রতিদান আল্লাহর কাছে কামনা করি। আল্লাহ আমাদের সন্তানদের দ্বীনের আলোয় উজ্জ্বল জীবন দান করুন। আমিন।

মিশকাত আহমদ
সম্পাদক

সূচিপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা
১. অদৃশ্য অতিথির অনুরোধ	৮
২. পাত্রে হাত দেবে না	১০
৩. হাসানের উপহার.....	১৩
৪. আলি মন থেকে নামাজ পড়ল.....	১৫
৫. ছোটো মুয়াজ্জিনের গল্প.....	১৭
৬. সাহেল ও তার ছোটো ভুল.....	১৯
৭. অ্যাডভেঞ্চার অব তামিম.....	২২
৮. কুরআনের পাঠশালা.....	২৬
৯. আজ মেহেরাবের মন ভালো নেই.....	২৯
১০. সালাম আর একবেলার খাবার.....	৩৩
১১. সময়ের মালিক.....	৩৬
১২. আগে যে সালাম দেয় সে-ই সর্বোত্তম.....	৩৯
১৩. শয়তানের কাজ.....	৪২
১৪. আল্লাহর দোহাই.....	৪৫
১৫. সম্মান ও শিষ্টাচারের পাঠ.....	৪৮
১৬. প্রশান্তিময় জুমা.....	৫০
১৭. মেঘের কোলে রোদ.....	৫৩
১৮. জমজমের সাপ.....	৫৬
১৯. ফজর নামাজ.....	৫৯
২০. একটি ছোটো কাজ.....	৬২
২১. সালামের শক্তি.....	৬৬
২২. সমাজে কুরআনের ফয়সালার বরকত.....	৬৯

২৩. জঞ্জলের বিচারক.....	৭৪
২৪. কাকডাকা ভোর.....	৭৭
২৫. প্রতিশ্রুতি.....	৭৯
২৬. পিপাসার্ত কুকুর.....	৮২
২৭. “রকি”র অভিষাপ.....	৮৪
২৮. হাই তোলার আদব.....	৮৮
২৯. ভুল হিসাব.....	৯১
৩০. কসমের কাফফারা.....	৯৪
৩১. স্পষ্ট কথা.....	৯৭
৩২. কবরের আজাব সত্য.....	১০০
৩৩. চায়ের দোকানের আড্ডায়.....	১০২
৩৪. তাড়াতাড়ি বোলো না!.....	১০৫
৩৫. রশি.....	১০৭
৩৬. শিশিরভেজা ভোর.....	১১০
৩৭. সত্যবাদী সালেহ.....	১১৩
৩৮. রাস্তার হক কী?.....	১১৬
৩৯. ফিরে আসার গল্প.....	১১৯
৪০. অনুমতি ছাড়া প্রবেশ নিষেধ.....	১২২
৪১. অন্ধ অনুকরণ.....	১২৬



অদৃশ্য অতিথির অনুরোধ

মদিনার ঘটনা। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উম্মাহর চিন্তায় নিমগ্ন থাকেন। কিংবা রবের ইবাদতে থাকেন মশগুল। কখনো সাহাবিদের নিয়ে দ্বীনের মজলিসে থাকেন। কোনো না কোনো ব্যস্ততা থাকে। কোনো এক দিনের ঘটনা। নবিজি শুনতে পেলেন অদ্ভুত কোনো কিছুর আওয়াজ। হঠাৎ চারপাশের বাতাসে কী এক অদ্ভুত সুর ভেসে এলো। সেই সুর বেশ অদ্ভুত হলেও কোমল। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বুঝতে পারলেন, তিনি একা নন। তাঁর সামনে ধীরে ধীরে আবির্ভূত হলো একদল অদ্ভুত প্রজাতি। তারা ছিল গভীর, চোখে গভীর শ্রদ্ধা, কিন্তু শরীরের গঠনে মানুষের চেয়ে একটু ভিন্ন।

প্রতিনিধিদলের একজন বলল, আমরা আল্লাহর সৃষ্টি। তাঁর এক মাখলুক। আমরা জিন। আমরা আল্লাহর প্রতি ঈমান এনেছি, এবং আপনার কাছ থেকে দীন শিখতে এসেছি।

“হে নবী! আমাদের একটা অনুরোধ আছে। আপনি আপনার উম্মতকে বলুন যেন তারা হাড়, গোবর, ও কয়লা দিয়ে ইস্তিনজা না করে। এ জিনিসগুলোতে আল্লাহ আমাদের জীবিকা রেখেছেন। [যদি তারা এগুলো নষ্ট করে, তবে আমরা ক্ষতিগ্রস্ত হই।]”

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম চিন্তিত হলেন না, কারণ তিনি জানতেন—এই অনুরোধ যৌক্তিক ও ন্যায়সংগত। তিনি বললেন, “আমি আমার উম্মতকে এ ব্যাপারে নিষেধ করব।”

স্টোরিজ ফ্রম সুনানু আবি দাউদ

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাহাবিদের বললেন,
“তোমরা হাড়, গোবর ও কয়লা দিয়ে ইস্তিনজা করবে না। এগুলোতে
একশ্রেণির সৃষ্টির জীবিকা রয়েছে।”^১

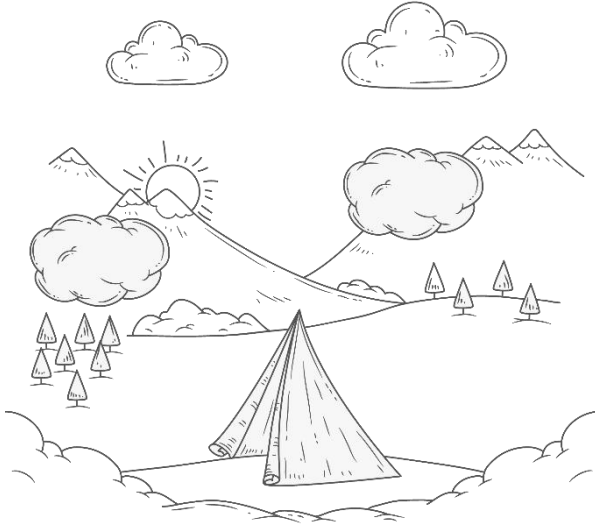
সাহাবিরা বিস্মিত হলেও বিনা প্রশ্নে তা মেনে নিলেন। কারণ তারা জানতেন,
রাসুলের জ্ঞান সীমাহীন, আর তাঁর প্রতিটি আদেশেই আছে হিকমা (প্রজ্ঞা)।

শিক্ষা:

আমাদের দেখার বাইরে এক জগৎ আছে, যাদেরও জীবন, সম্মান ও অধিকার
রয়েছে।

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম শুধু মানুষের জন্য নন, সকল সৃষ্টির জন্য
রহমত।

পরিচ্ছন্নতা ও দয়া—এই দুটি গুণ ইসলামের গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা।



১. সুনানু আবি দাউদ : ১/১০, হাদিস নং : ৩৯



পাত্রে হাত দেবে না

হাসান ক্লাস সিক্সে পড়ে। খুবই চঞ্চল প্রকৃতির এক বালক। তার জগৎ জুড়ে আছে খেলাধুলা, ছবি আঁকা আর চিপস-চকলেটের মতো মজার সব জিনিস। বেশিরভাগ সময় সে এসব নিয়েই ব্যস্ত থাকে।

রাতে ঘুমোতে যাওয়ার আগে সে নিজের ক্যানভাস নিয়ে বসে। রংতুলিতে সে আঁকে মনের মতো ছবি। রাজ্যের যত রং—লাল, নীল, সবুজ, হলুদ—সব যেন তার আঙুলে এসে মিশে যায়। ছবি আঁকতে আঁকতেই চোখ জড়িয়ে আসে ঘুমো। ক্যানভাস রেখে সে বিছানায় গা এলিয়ে দেয়।

কিন্তু মাঝরাতে ঘুম ভেঙে যায় হাসানের। খুব পিপাসা পেয়েছে তার। পাশে রাখা একটা পানির পাত্র থেকে হাত ডুবিয়ে গ্লাসে করে পানি নেয় সে, তারপর পানি পান করে আবার ঘুমিয়ে পড়ে।

সকালে ঘুম থেকে উঠে হাসান টের পেল, পেটটা কেমন করছে। ব্যথা! একটু পরেই বমি শুরু হলো। স্কুলে যাওয়ার সব প্রস্তুতি বাতিল করতে হলো।

ডাক্তার এসে বললেন,

—কোনো নোংরা জিনিস থেকে ব্যাকটেরিয়া শরীরে ঢুকেছে। হয় খাবার, নয়তো পানি থেকে।

হাসানের মা খুব চিন্তায় পড়ে গেলেন।

—আমি তো সব সময় পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার দিকে খেয়াল রাখি! তবে সমস্যা হলো কোথায়?

হাসান সন্ধ্যায় মসজিদের হিফজ বিভাগে পড়াশোনা করে। সেদিন ক্লাসে মাওলানা ইমরান সাহেব একটি হাদিস বলছিলেন। হাসান তখন অসুস্থতা ভুলে মন দিয়ে শুনতে লাগল।

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন—

“তোমাদের কেউ রাতে জেগে উঠলে, সে যেন নিজের হাত তিনবার না ধুয়ে পানির পাত্রে না ডোবায়। কারণ সে তো জানে না, ঘুমের মধ্যে তার হাত কোথায় ছিল!”^১

মাওলানা ইমরান সাহেব ব্যাখ্যা করলেন—“রাতে ঘুমের সময় আমাদের হাত কখনও বিছানার নিচে, শরীরের ভাঁজে বা মুখ-নাকের আশপাশে চলে যেতে পারে, আর আমরা সেটা টেরই পাই না। তাই হাত না ধুয়ে যদি কেউ সরাসরি পানির পাত্রে হাত ডোবায়, তাহলে সেই পানি নোংরা বা জীবাণুযুক্ত হয়ে যেতে পারে।।”

হাসান তখন চোখ বড়ো বড়ো করে চিন্তা করতে লাগল,

—আরে! আমি তো একদম তা-ই করেছি! রাতের বেলা ঘুম থেকে উঠে, হাত না ধুয়েই সোজা পানির পাত্রে হাত ডুবিয়ে পানি নিয়ে পান করেছিলাম!

পরদিন একটু সুস্থ হওয়ার পর হাসান মসজিদে গিয়ে মাওলানা ইমরান সাহেবকে সবকিছু খুলে বলল। মনোযোগ দিয়ে শুনে মাওলানা সাহেব বললেন,

—দেখো, হাদিস শুধু নামাজ আর রোজার নিয়ম শেখায় না; হাদিস আমাদের স্বাস্থ্যবিধি, শিষ্টাচার আর নিরাপত্তার কথাও বলে। নবীজির এসব উপদেশ মানলে আমরা শুধু আখিরাতেই নয়, দুনিয়াতেও সুস্থ ও নিরাপদ থাকতে পারি।

হাসান বলল,

—ওস্তাদ, এখন থেকে যদি রাতের বেলা ঘুম ভেঙে যায়, তাহলে আগে তিনবার হাত ধুয়ে তারপরই পানি খাব। আর এই কথা আমি আমার বন্ধুদেরও বলব।

মাওলানা সাহেব হেসে মাথা নেড়ে বললেন,

—এটাই তো একজন সচেতন মুসলিম শিশুর কাজ!

১. সুনানু আবি দাউদ : ১/২৫ হাদিস নং : ১০৩

সেদিন বাড়ি ফিরে হাসান নিজের পানির বোতলে একটা রঙিন স্টিকার লাগিয়ে দিলো। তাতে সুন্দর করে লিখল—

“তিনবার হাত ধোব, তারপর পাত্রে হাত দেবো; রাসুলের কথা মানব, সবসময় ভালো থাকব!”

হাসান নিজের ছোটো বোন রিমুকে খুব আদরের সুরে বলল,

—শোন রিমু, যদি রাতের বেলায় পানি খেতে উঠিস, আগে কিন্তু হাত ধুয়ে নিবি। জানিস তো, রাতে ঘুমের মধ্যে হাত কোথায় ছিল, সেটা কেউ জানে না!

রিমু গোল গোল চোখ করে বলল,

—আমার তো মনে হয়, আমার হাতটা সারা রাত বালিশের নিচেই ছিল!

হাসান হেসে গড়াগড়ি খেতে খেতে বলল,

—হাহা! ঠিক আছে, বালিশে হোক আর মাটিতে হোক—হাত তো ধুতে হবেই! এটা কিন্তু হাদিস!

শিক্ষা :

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদের জীবনের প্রতিটি দিকেই সুন্দর দিক-নির্দেশনা দিয়ে গিয়েছেন। এমনকি ঘুম থেকে উঠে কীভাবে নিজের স্বাস্থ্য সুরক্ষা করতে হবে, তাও তিনি শিখিয়েছেন। আসলে একটু সচেতন হলে অনেক রোগবালাই থেকে সহজেই রক্ষা পাওয়া যায়।

তাই আমাদের উচিত—সবসময় স্বাস্থ্যবিধি মানা আর পবিত্রতার প্রতি যত্নবান হওয়া।





হাসানের উপহার

এক গ্রামে হাসান নামে এক ছোটো ছেলে বাস করত। সে ছিল খুব দয়ালু। বাবা একদিন তাকে একটি নতুন বল কিনে দিলো। বলটি লাল রঙের ছিল; ওই বল দিয়ে খেলতে হাসানের ভারি মজা লাগত। হাসানের ছোটো বন্ধু ইমরান বলটি দেখে খুব খুশি হলো। তার কোনো খেলনা ছিল না।

হাসান ইমরানের দিকে তাকিয়ে বলল,

—ইমরান, তুমি এই বলটা রাখো। এটা দিয়ে খেলা করো। তুমি তো খেলনা পাও না।

ইমরান আনন্দে লাফিয়ে উঠল। সে বল নিয়ে মাঠে খেলতে লাগল। আর মনে মনে এই ভেবে আনন্দিত হলো যে, তারও একটা বল হলো। বাসায় নিয়ে তার বোন আমিনার সাথেও এই বল দিয়ে খেলতে পারবে।

কিন্তু কিছুক্ষণ পরে হাসানের মনে হলো, বলটা তো নতুন। তারও খেলার ইচ্ছে হচ্ছে। সে ইমরানের কাছে গিয়ে বলল,

—ইমরান, আমার বলটা আমাকে ফেরত দাও। আমি তোমাকে দেবো না।

ইমরান কষ্ট পেয়ে বলটা ফেরত দিলো। সে চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইল। হাসান বল নিয়ে চলে গেল, কিন্তু তার মনের ভেতরে অদ্ভুত খারাপ লাগা শুরু হলো।

বাড়িতে এসে হাসান তার দাদুকে সব কথা বলল। দাদু মুচকি হেসে বলল, “হাসান, প্রিয়নবি হজরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

যে ব্যক্তি কাউকে কোনো কিছু দান করে, পরে তা আবার ফেরত চায়—তার উদাহরণ সেই কুকুরের মতো, যে নিজেই বমি করে পরে আবার তা খেয়ে ফেলে।

কেউ যদি কাউকে কিছু দান করে, তবে সেটা আবার ফেরত নেওয়া একেবারে অনুচিত। এমন পরিস্থিতিতে সে যেখানে দাঁড়িয়ে আছে, সেখানেই তাকে থামিয়ে দেওয়া উচিত; আর যে জিনিসটি সে ফেরত নিয়েছে, সেটিই যেন তার হাতে বুঝিয়ে দেওয়া হয়। তাকে সেই জিনিসটাই ফিরিয়ে দেওয়া উচিত, যা সে একবার দান করেছিল।”^১

হাসান লজ্জা পেল। সে ভাবল কুকুর যদি বমি খায়, তা কত নোংরা হয়! সে বুঝতে পারল সে ভুল করেছে। হাসান দৌড়ে ইমরানের কাছে গেল। বলটা আবার তার হাতে দিয়ে বলল,

—ইমরান, এটা তোমার। আমি আর ফেরত নেব না। ক্ষমা করে দাও।

ইমরান হেসে উঠল, এরপর তারা একসঙ্গে খেলায় মেতে উঠল। খেলতে খেলতেই হাসান থমকে দাঁড়াল। তার মনে একটা গভীর উপলব্ধি জাগল— সত্যিকারের আনন্দ তো তখনই আসে, যখন আমার কারণে আরেকজনের মুখে হাসি ফোটে।

শিক্ষা:

যারা নিঃস্বার্থভাবে দান করে, আল্লাহ তাদের ভালোবাসেন। শিশুরা যদি ছোটবেলা থেকেই এই সুন্দর গুণটি অর্জন করে, তাহলে বড়ো হয়ে তারা হবে হৃদয়বান ও উদার মানুষ।

দান বা উপহার দেওয়ার সময় মন থেকে দিতে হয়। এমনভাবে, যেন পরে ফেরত চাওয়ার মতো কোনো ভাবনাই মনে না আসে।

বন্ধুদের মাঝে ভালোবাসা ও বন্ধন দৃঢ় করতে উপহার ও দান একটি সুন্দর মাধ্যম। এটি সম্পর্ককে আরও মজবুত ও মধুর করে।





আলি মন থেকে নামাজ পড়ল

আলি ছিল খুবই চঞ্চল স্বভাবের এক ছেলে। খেলাধুলা, দৌড়ঝাঁপ আর মজার গল্প বলায় তার দিন কাটত। তাতেই বহু সময় মেতে থাকত। কিন্তু অল্প সময়ের নামাজে তার মন স্থির থাকত না। কখনো নামাজে ভাবত, “আম্মু আজ কী রান্না করেছে?” আবার কখনো মনে পড়ে যেত, “তৌহিদ ভাইয়ের সাথে তো আজ ক্রিকেট খেলতে হবে!”

একদিন মসজিদে ইমাম সাহেব একটি হাদিস বললেন,

“যে ব্যক্তি ভালোভাবে অজু করে, তারপর একাগ্রতার সঙ্গে দুই রাকাত নামাজ আদায় করে, তার আগের সব গুনাহ মাফ করে দেওয়া হয়।”^১

আলি বিস্ময়ে চোখ বড়ো বড়ো করে ভাবল,

“আমার এসব ছোটো ছোটো ভুল যদি এভাবে মাফ হয়ে যায়, তাহলে আমাকে একবার চেষ্টা করতেই হবে!”

সেদিন আলি খুব মন দিয়ে অজু করল। হাত, পা, মুখ, নাক—সবকিছু নিয়ম মেনে ধুয়ে নিল সে। তারপর এক শান্ত কোণে দাঁড়িয়ে গেল নামাজ পড়তে। আজ সে নিজেই ঠিক করে নিয়েছিল—নামাজে কোনো তাড়াহুড়ো নয়, অকারণ চিন্তা নয়!

তাকবির বলল মনোযোগ দিয়ে, ধীরে ধীরে সুরা ফাতিহা পড়ল, তারপর আরেকটি সুরা।

১. সুনানু আবি দাউদ : ৯০৫

বুকু করল পরম শ্রদ্ধায়, সিজদা দিলো অসীম ভালোবাসা নিয়ে। দুই রাকাত শেষ হলে আলির মুখে ফুটে উঠল এক অনাবিল আনন্দের হাসি!

সে ভাবল, আজ আমি আল্লাহর সাথে একান্তে কথা বলেছি। আমি মন থেকে নামাজ পড়েছি। যদি আল্লাহ আমার গুনাহগুলো মাফ করে দেন, তবে এর চেয়ে বড়ো সুখ আর কী হতে পারে!

শিক্ষা:

ভালোভাবে অজু করা ইবাদতের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

নামাজে মনোযোগ রাখা উচিত।

একাগ্রতার সঙ্গে দুই রাকাত নামাজ গুনাহ মার্ফের বড়ো মাধ্যম

ছোটো ছোটো ভালো কাজ আল্লাহর কাছে অনেক বড়ো হয়ে যায়।





ছোটো মুয়াজ্জিনের গল্প

গ্রামের এক কোণে থাকত ছোট একটি ছেলে। নাম তার ইমরান। বয়স মাত্র সাত। কিন্তু দুশ্চুমি এমন করত, যেন পুরো গ্রামটাই নড়ে উঠত! তবে ইমরানের বাবা ছিলেন একজন সম্মানিত আলেম। নামাজ নিয়ে তার মনে ছিল গভীর মমতা আর দায়িত্ববোধ। একদিন তিনি ইমরানকে আদর করে কাছে ডাকলেন।

বললেন,

— ইমরান, আজ থেকে তুমি আমার সঙ্গে পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ পড়বে।

ইমরান চমকে উঠল,

— বাবা! আমি তো এখনও ছোটো!

বাবা মুচকি হেসে বললেন,

— হ্যাঁ, ছোটোই তো। কিন্তু শেখার শুরুর ছোটোবেলা থেকেই। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

“তোমরা যখন দেখো তোমার সন্তান সাত বছর বয়সে পৌঁছেছে, তখন তাকে নামাজের আদেশ দাও। আর দশ বছরে পৌঁছেও যদি না পড়ে, তবে তাকে (নরমভাবে শাসন করে) নামাজে অভ্যস্ত করো।”^১

ইমরান মাথা নিচু করল। কিছুটা বুঝল, কিছুটা না।

তবুও সে বাবার কথায় ভরসা রেখে নামাজে যাওয়া শুরু করল।

প্রথম দিনেই জুতা হারিয়ে ফেলল, দ্বিতীয় দিন অজু করতে গিয়ে পুরো শরীরে পানি ঢেলে দিলো। তৃতীয় দিন রুকুতে দাঁড়িয়ে রইল, আর সিজদায় গিয়ে বসে পড়ল।

১. সুনানু আবি দাউদ : ৪৯৪

তবুও বাবা কখনো রাগ করতেন না। শুধু মৃদু হেসে বলতেন,

—“আল্লাহ খুব খুশি হচ্ছেন, বাবা। একদিন তুমিও সব শিখে যাবে।”

দেখতে দেখতে অনেক দিন কেটে গেল...

ইমরান এখন নয় বছরে পা দিয়েছে। একদিন মসজিদের মুয়াজ্জিন হুজুর অসুস্থ হয়ে পড়লেন। ইমরান এগিয়ে গিয়ে মাইকের সামনে দাঁড়াল। তার কণ্ঠে ভেসে উঠল সুরেলা আজান—

আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার...

পুরো মসজিদ তাকিয়ে দেখল—একটা ছোট্ট ছেলে কী সুন্দর করে আজান দিচ্ছে!

দশ বছর বয়সে ইমরান এখন একেবারে নিয়মিত নামাজি। কারও কিছু বলার আগেই নিজেই তাগাদা দেয়—“চলুন বাবা, জামাতে দেরি হয়ে যাচ্ছে!”

বাবা একদিন মমতায় মাথায় হাত বুলিয়ে বললেন, “দেখেছ, আমার ছোটো মুয়াজ্জিন! রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাদিস কতটা বরকতময়। সময়মতো শেখালে জীবন সত্যিই সুন্দরভাবে গড়ে ওঠে।”

শিক্ষা :

এই হাদিস আমাদের শেখায়—শিশুদের শৈশবেই নামাজের গুরুত্ব বুঝিয়ে দেওয়া জরুরি। তবে সেটা হতে হবে স্নেহ দিয়ে, ধৈর্য ধরে। ঠিক সময়েই যদি সঠিক দিক-নির্দেশনা দেওয়া যায়, তবে গড়ে ওঠে বিশ্বাস, নিয়মানুবর্তিতা আর এক দৃঢ় ও আলোকিত চরিত্র।





সালাম আর একবেলার খাবার

ঢাকার এক গলির মাথায় ছোট্ট এক চায়ের দোকান—কচি ভাইয়ের দোকান। ভোরবেলা সিটি কর্পোরেশনের ঝাড়ুদাররা ক্লান্ত শরীরে এসে বসে পড়েন। কচি ভাই তখন কেতলি থেকে গরম চা ঢেলে দেন তাদের কাপে। সঙ্গে দেন দুটো করে বিস্কুট—একদম ফ্রি। কেউ টাকা দেয়, কেউ দেয় না। তা কচি ভাই কখনো গোনে না। যেন না গুনে দিতে চান অগণিত ভালোবাসা।

একই গলিতে বাস করে এক খাটো মানুষ—সাব্বির। বয়স পঁচিশ; দেখতে যেন চল্লিশ। না কোনো কাজ, না কোনো ঘরবাড়ি। রাতে প্লাস্টিক কুড়ায়, সারাদিন ফুটপাথে ঘুমায়। পথের মানুষজন পাশ কাটিয়ে যায়। কেউ দেখে না, কেউ চেনে না। কেননা, সাব্বির যেন মানুষ নয়, শুধু কোনো অপ্রাসঙ্গিক ছায়া।

একদিন সকালবেলায় এক ভিন্ন মুখ দেখা গেল গলির মাথায়। পরনে সাদা পাঞ্জাবি, মুখে হালকা দাড়ি—শহিদ ভাই। এ এলাকার কেউ নন, তবু প্রতিদিন আসেন—একেকদিন একেক রকম খাবার নিয়ে। খিচুড়ি, কখনো বুটি-ডিম, কখনো শুধু চা-বিস্কুট। গরিবদের বিলি করেন।

সেদিন তিনি এনেছেন খিচুড়ির হাঁড়ি।

লোকেরা ভিড় করছে। আর দূরে দাঁড়িয়ে আছে সাব্বির—

চোখে একরাশ লজ্জা, একরাশ না-পাওয়ার অভিমান।

ঠিক তখন শহিদ ভাই তার দিকে এগিয়ে এলেন।

এক থালা খিচুড়ি বাড়িয়ে বললেন,

“ভাই, আসো। খাও। আজ কেউ বাদ যাবে না।”

সাব্বির মাথা নিচু করে আস্তে বলল,

“আমি চোর না ভাই। আমার ঘরবাড়ি নেই। রাতে প্লাস্টিক কুড়াই, সকালে বিক্রি করি, যা পাই তা দিয়েই কোনোরকমে পেট চালাই। এই এলাকার মানুষ আমাকে

চোর ভাবে। কেউ কিছু খেতে দেয় না, সবাই দূরে সরে যায়। কিন্তু আমি খারাপ না... সত্যি বলছি।”

শহিদ ভাই মৃদু হেসে বললেন,

“কে বলেছে তুমি খারাপ? তুমি তো শুধু একজন ক্ষুধার্ত মানুষ।”

এই বলে তিনি সাক্ষিরের হাত ধরে বসিয়ে দিলেন।

প্লাস্টিকের প্লেটে গরম খিচুড়ি তুলে দিলেন, পাশে রাখলেন পানির বোতল।

খাওয়ার আগে শুধু একটি কথা বললেন—

“আসসালামু আলাইকুম, ভাই।”

এই একটি সালাম যেন সাক্ষিরের ভিতরকার সব তালা খুলে দিলো। তার মনে হলো, বহু বছর পর কেউ তাকে মানুষ মনে করল। খাওয়া শেষে সে চুপ করে বসে রইল, তবে চোখ তার ছলছল। শহিদ ভাই পাশে বসে বললেন,

“জানো, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ইসলামে সবচেয়ে উত্তম কাজ কোনটি?”

সাক্ষির মাথা নাড়ল—সে জানে না।

শহিদ ভাই বললেন,

“তাহলে শোনো, হজরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন,

এক ব্যক্তি নবীজিকে সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জিজ্ঞেস করলেন:

ইসলামে সর্বোত্তম কাজ কী?

তিনি বললেন :

ক্ষুধার্তকে খাবার খাওয়ানো এবং পরিচিত-অপরিচিত সবাইকে সালাম দেওয়া।”^১

স্টোরিজ ফ্রম সুনানু আবি দাউদ

সাব্বিরের চোখ বেয়ে নীরব অশ্রু গড়িয়ে পড়ল। সেই দিন থেকেই সে শহিদ ভাইয়ের ছায়ায় থাকতে শুরু করল। খাবার বিলির সময় স্বেচ্ছাশ্রম দেয়, হাঁড়ি ধরে, প্লেট বাড়িয়ে দেয়।

আর প্রতিটি প্লেটের সঙ্গে দেয় একটি অমূল্য উপহার—

একটি সালাম।

“আসসালামু আলাইকুম, ভাই।”

শিক্ষা:

একটি সালাম আর একবেলার খাবার—একজন মানুষের জীবন বদলে দিতে পারে।

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাদিস শুধু কিতাবের পাতায় নয়, হৃদয়ে ধারণ করলে তা বাস্তব জীবনে আলো হয়ে জ্বলে ওঠে।





সময়ের মালিক

রাত তখন ঠিক বারোটা। হাসপাতালের আইসিইউয়ের লাল বাতিটা নিঃশব্দে টিমটিম করে জ্বলছে—ভেতরে জীবন-মৃত্যুর এক নিঃশব্দ লড়াই। সেখানে লড়ছে মুহাইমিন, তেইশ বছরের এক তরুণ। মাথায় গুলির চিহ্ন, বুকটা ওঠানামা করছে। যেন এখনই প্রাণবায়ু উড়ে যাবে।

করিডরের এক কোণে বসে আছেন রাশিদা বেগম—মুহাইমিনের মা। দু-চোখে শূন্যতা, হাতে তাসবিহ। চোখের পানি শুকিয়ে গেছে অনেক আগেই। হঠাৎ করেই পাশে এসে বসে এক তরুণ—মাহির। চেনা নয়, আত্মীয়ও নয়। তবুও আজ অনেক কাছের কেউ। কারণ রাজপথে মুহাইমিন যখন গুলিবিদ্ধ হয়ে পড়েছিল, এই মাহিরের কোলেই তার শরীরটা হেলে পড়েছিল—অচেনা এক তরুণের জীবনপ্রদীপ নিভে যাওয়ার আগে শেষ যে বুক আশ্রয় দিয়েছিল, সেটি ছিল মাহিরের। তাই সেও আজ অনেক ব্যথিত।

—আন্টি, উনি কি আপনার ছেলে?

“হ্যাঁ”—কণ্ঠে যেন গলিত সিসার ভার। “মুহাইমিন... মেডিকেলের ছাত্র ছিল। কোটা আন্দোলনে গিয়ে গুলি খেয়েছে। কে জানত, এমন দিন দেখতে হবে! আল্লাহ! শুধু আমাকেই দেখলেন; আমার কোলটাই খালি করে নিচ্ছেন! হায় কপাল... হায় দুঃসময়...”

মাহির কিছুক্ষণ চুপ করে রইল। তারপর ধীরে বলল,

—আন্টি, আমি যদি কিছু বলি—আপনি রাগ করবেন না তো?

রাশিদা বেগম নিঃসাড় কণ্ঠে বললেন,

“বলো বাবা।”

মাহির একটু কাছে এগিয়ে এসে কাঁপা কণ্ঠে বলল,

“আজ আপনার ছেলে মৃত্যুর মুখোমুখি, আপনি আল্লাহকে দায় দিচ্ছেন? তাঁর প্রতি অভিযোগ করছেন?”

রাশিদা চুপ। চোখদুটো নামিয়ে রাখলেন। কোনো শব্দ বের হলো না ঠোঁট থেকে।

মাহিরের কণ্ঠটা এবার আরও গম্ভীর হয়ে উঠল,

“আন্টি, আমি আপনাকে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের একটি হাদিস শোনাতে চাই।”

তারপর ধীরে ধীরে সে বলতে শুরু করল—

“হজরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, আল্লাহ তাআলা বলেন, ‘মানুষ যখন কালের নিন্দা করে, তখন সে আমাকেই কষ্ট দেয়। কেননা আমিই তো কাল (কালের নিয়ন্ত্রক); আমিই রাত ও দিনকে পরিবর্তন করি, সবকিছু আমার হাতেই।’”^১

কথাগুলো যেন করিডরের নিস্তব্ধতাকে কাঁপিয়ে দিলো। রাশিদার বুকের ভেতর কিছু একটা নড়ে উঠল। মুহাইমিনের শৈশব মনে পড়ে গেল—নামাজে তাকে ঘুম থেকে তুলতেন, কুরআন মুখস্থ করাতেন। আর এখন?

—আমরা সময়কে দোষ দিই, কিন্তু সময় তো আল্লাহরই সৃষ্টি।

মাহিরের কথা চলতে থাকে—“তিনি আমাদের পরীক্ষা নেন সময় দিয়েই; কখনো সুখের সময়, কখনো দুঃখের সময়। আমরা কি এই পরীক্ষায় ধৈর্য হারিয়ে তাঁকেই দায়ী করব?”

রাশিদার চোখ থেকে অবশেষে একফোঁটা অশ্রু ঝরে পড়ে। এই প্রথমবার, তিনি মাথা নিচু করে ফিসফিসিয়ে বললেন, “আমার রব তো সময়ের মালিক। তিনি যদি চান, মুহাইমিনকে ফিরিয়েও দিতে পারেন।” মনে এক সুপ্ত বাসনা জেগে উঠল; হয়তো আমার ছেলের ঘুমে জেগে উঠবে দেশ। আরও অনেক মানুষের ভালো হবে। এই ভেবে সময় যাচ্ছিল। আন্দোলন তীব্র থেকে তীব্রতর হলো।

১. সুনানু আবি দাউদ : ৪/৩৫৯, হাদিস নং : ৫২৭৪

একসময় জালিমের পতন হলো। ৩৬ জুলাই ইতিহাসের সেই দিনটি ছিল ৫ই আগস্ট ২০২৪।

এরপর কেটে গেল কতদিন... মা আশায় থাকেন। ঠিকই একদিন মুহাইমিন জেগে উঠল। মা দেখলেন আইসিইউয়ের দরজা খুলে গেছে। ডাক্তাররা বেরিয়ে এলেন। চোখে ক্লান্তি, মুখে এক রহমতের হাসি—“মুহাইমিন রেসপন্স করছে। আমরা তাকে সেভ করে ফেলেছি।” কিন্তু পরক্ষণেই মায়ের ঘুম ভাঙে। তিনি কাঁদেন আর তাকিয়ে থাকেন, আকাশের দিকে। চোখে আলো, মুখে দুআ—

“ইয়া মালিকুয্ যামান, তুমি সময়ের মালিক—তুমি জীবন দান করো, মৃত্যু দাও। তুমি চাইলেই সব সম্ভব।” আজ দেশকে বাঁচাতে গিয়ে হয়তো আমার বুক খালি হয়েছে। কিন্তু স্বাধীন দেশের পতাকা আবারও পত পত করে উড়ছে।

যারা শহিদ হয়ে গেলেন, আপনারাই প্রকৃত বীর; যাবতীয় ক্রেডিট আপনারদের।

শিক্ষা :

সময়কে দোষ না দিয়ে আমাদের উচিত আল্লাহর দিকে ফিরে যাওয়া। তিনিই সময়ের মালিক ও পরিচালক। তিনি যখন চান, তখন সবকিছু বদলে দেন। তাই ধৈর্য, তাওয়াক্কুল আর দুআর মধ্যে থেকেই সময়কে যাপন করতে হয়।





আগে যে সালাম দেয় সে-ই সর্বোত্তম

পুরান ঢাকার একটি প্রাচীন দোতলা বাড়ি। সেখানে পাশাপাশি থাকে দুই ভাই—জাবির ও জাহিদ। রক্তের সম্পর্ক। প্রায় সমবয়সি। শৈশবের প্রতিটি ধাপে তারা ছিল অবিচ্ছেদ্য—পড়াশোনা, খেলাধুলা, ঈদ, রোজা—সবই তারা ভাগ করে নিয়েছে একসঙ্গে। কিন্তু হঠাৎ একদিন একটিমাত্র ভুল বোঝাবুঝি। ভুল বোঝাবুঝিতে ছেদ পড়ে সেই বন্ধনে। জাহিদ রাগ করে কথা বলা বন্ধ করে দেয়। জাবিরও অপমানবোধে নীরব হয়ে যায়। দুঃখ পেয়ে দূরে সরে যায়।

প্রথমে আশায় দিন গেল তিন, তারপর সাত... তারপর এক বছর। এভাবেই পার হয়ে গেল অনেক বছর। একই বাড়ি, একই সিঁড়ি ব্যবহার করেন; এক ছাদের নিচে থাকেন, এক মসজিদে নামাজ পড়েন, দেখা হয়—তবু কোনো চোখে চোখ পড়ে না। সালাম নেই, খবর নেই। কে খায়, কে উপোস থাকে—জানার প্রয়োজন মনে করে না কেউ। অথচ এক সময় এক রান্নাঘর, এক টেবিলে খেতেন। শৈশবের কতশত স্মৃতি জুড়ে আছে জাহিদ-জাবিরের। আর এই বিচ্ছেদের দেওয়াল গড়ে তুলেছে একটাই জিনিস—অহংকার। শয়তানের সবচেয়ে বড়ো অস্ত্র। আর অহংকারই পতনের মূল। অতি কাছের দুটো হৃদয় তাই আজ যোজন যোজন দূরে।

এভাবে সময় গড়িয়ে যায়, দিনশেষে রাত আসে। কিন্তু...

এক জুমার দিন। মসজিদের ইমাম সাহেব বয়ান করছিলেন—আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষার গুরুত্ব নিয়ে। কুরআন-হাদিসের আলোকে সম্পর্কের বন্ধনকে শক্তিশালী করার কথা বলেন। বলেন, আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্নকারী জাহান্নামের পথে চলে যায়। কিন্তু কোনো কিছুই যেন তাদের দুজনের মন গলাতে পারছিল না। হঠাৎ বয়ানের মধ্যে ইমাম সাহেবের বলা এই হাদিসটি ছুঁয়ে যায় উভয়ের মন। হাদিসটি হলো—

হজরত আবু আইয়ুব আনসারি রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, “একজন মুসলিমের পক্ষে তার নিজের ভাইকে তিন দিনের বেশি বর্জন করা বৈধ নয়। এমনভাবে যে, সাক্ষাৎ হলে উভয়ই মুখ ঘুরিয়ে নেয়। আর তাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি সে, যে প্রথমে সালাম দেয়।”^১

জাবিরের অন্তর কেঁপে উঠল। তার চোখের সামনে ভেসে উঠল জাহিদের মুখ। বয়ান শেষে ইমাম সাহেব বললেন, “ভাইয়ের সাথে তিন দিনের বেশি সম্পর্ক ছিন্ন রাখা মানে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সুন্যাহর বিরুদ্ধে যাওয়া। এমনকি আল্লাহর বিধান লঙ্ঘন করা। কুরআন-হাদিস অমান্য করা কত বড়ো গুনাহ! তাঁদের শিক্ষা না মেনে কি প্রকৃত সফলকাম হওয়া সম্ভব?” আর অস্বীকারকারী তো মুমিনই থাকে না।

মসজিদ থেকে বের হয়ে জাবির সোজা চলে গেল জাহিদের বাসায়। দরজায় কড়া নাড়ল।

জাহিদ দরজা খুলতেই জাবির বলল,

“আসসালামু আলাইকুম ওয়া রহমাতুল্লাহ।”

জাহিদের চোখ ছলছল করে উঠল। কয়েক সেকেন্ড চুপ থেকে সে উত্তর দিলো—
ওয়া আলাইকুমুস সালাম ওয়া রহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহ।

দুজনের চোখে ঝিলমিল করছে অশ্রু। তারা পরস্পরকে জড়িয়ে ধরল। ভুলে গেল দূরত্বের অজস্র দেওয়াল। নীরবতা ভেঙে জাবির বলল—ভাই, ভুল হতেই পারে। কিন্তু ভাইয়ের সঙ্গে আর এমন দূরত্ব রাখা ঠিক নয়।

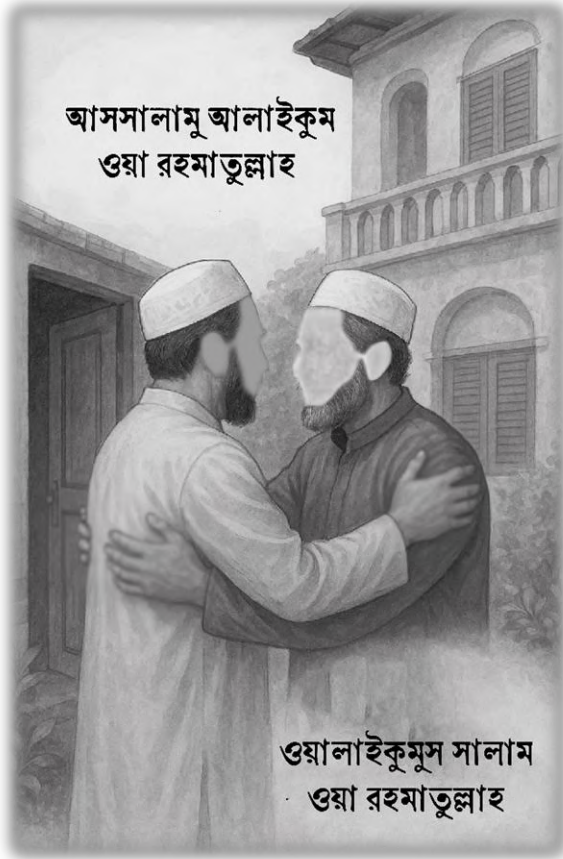
জাহিদ কান্নাভেজা কণ্ঠে বলল, আজকের খুতবা না শুনলে হয়তো আমরা আরও দূরে সরে যেতাম।

সেদিন থেকেই তারা আবার একে অপরের জীবনে ফিরে এলো। আর সত্যিকারের ভাই হয়ে উঠল।

১. সুনানু আবি দাউদ : ৪/২৭৯, হাদিস নং : ৪৯১১

শিক্ষা:

১. আত্মীয়ের সঙ্গে তিন দিনের বেশি কথা না বলা ইসলামে নিষেধ।
২. রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদের শিখিয়েছেন, প্রথমে সালাম দেওয়া মানুষ সবচেয়ে উত্তম।
৩. দুনিয়ার ভুলগুলো ছোটো হতে পারে, কিন্তু সম্পর্ক বড়ো—তাই সব রাগ ভুলে গিয়েও সম্পর্ক ভালো রাখাই আসল।





শয়তানের কাজ

নিভৃত এক গ্রামে থাকে রাইয়ান। অষ্টম শ্রেণিতে পড়ে সে। খুব ভালো ছেলে। নামাজের ব্যাপারে নিয়মিত—প্রায় কোনো নামাজই তার বাদ যায় না। তার বাড়ির পাশেই একটা ছোট মসজিদ। যেখানে সে পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ পড়ে।

রাইয়ানের এক ঘনিষ্ঠ বন্ধু আছে—নাফি। শুধু বন্ধু বললে ভুল হবে। ওরা একসঙ্গে খেলাধুলা করে। একসঙ্গে স্কুলে যায়। প্রায় সব সময় একসঙ্গে সময় কাটায়। কিন্তু একটা জায়গায় তাদের পার্থক্য—নাফি নামাজে অমনোযোগী।

একদিন দুপুরে গ্রামের মাঠে বৃষ্টি শুরু হলো। বৃষ্টিতে সবাই মজা করে ফুটবল খেলছে। আজ বেশ উপভোগ্য আবহাওয়া। কাদায় মাখামাখি করে ফুটবল খেলার আলাদা আনন্দ। তার ওপর স্কুল ছুটি থাকায় যেন আনন্দ আরও বেড়ে গেল। খেলার মজায় কারও খেয়ালই ছিল না—কখন যে দুপুর গড়িয়ে গেল!

হঠাৎ মসজিদ থেকে আজানের আওয়াজ ভেসে এলো। রাইয়ান বুঝল—নামাজের সময় হয়ে গেছে। বাড়ি গিয়ে প্রস্তুত হতে গেলে নামাজ ছুটে যাবে। তাই সে মাঠের এক পাশে পুকুরে গিয়ে ভালো করে হাত-পা ধুয়ে অজু করল। তারপর বন্ধুদের বলল,

—চলো, এবার নামাজ পড়ি। কিন্তু সবাই নানা অজুহাত দিতে লাগল,

—ভিজে গেছি, নামাজ তো বাড়িতে গিয়েও পড়া যাবে, এখন খেলতে দাও। নাফিও তাদের সঙ্গে একমত হলো। রাইয়ান আর সময় নষ্ট করল না। সে ওর আরও তিনজন বন্ধুকে নিয়ে স্কুলের উঠোনে গিয়ে জায়গাটা পরিষ্কার করল, তারপর ওখানেই দাঁড়িয়ে গেল নামাজে।

এদিকে খেলা থামেনি। নাফি আর ওর অন্য বন্ধুরা ফুটবল নিয়ে প্র্যাকটিস করছে। হঠাৎ নাফির পায়ে লেগে বল গড়িয়ে গেল রাইয়ানদের কাছে। সে বল আনতে গিয়ে নামাজরত রাইয়ানের সামনে দিয়ে হেঁটে যেতে লাগল।

রাইয়ান তখন সিজদা থেকে উঠছিল। সিজদা থেকে উঠেই হাত বাড়িয়ে সে ইশারায় তাকে থামাল। নাফি একটু বিরক্ত হয়ে বলল—আরে ভাই, একটু সামনে দিয়ে যাচ্ছি, তাতে কী হয়েছে? নামাজে তো আর ব্যাঘাত ঘটাইনি!

রাইয়ান কিছু বলল না। আবার মন দিলো নামাজে। কিন্তু নাফি আবার পার হওয়ার চেষ্টা করল। এবারও রাইয়ান হাত বাড়িয়ে বাধা দিলো।

নামাজ শেষ হলে রাইয়ান ধীরে ধীরে নাফির দিকে তাকিয়ে মুচকি হেসে বলল,
—দোস্ত, আজ তোমাদের একটা হাদিস শোনাই। নাফি কৌতূহল নিয়ে জিজ্ঞেস করল,

—কী হাদিস?

রাইয়ান বলল,

“আবুল ওদ্দাক (রহ.) নামে একজন তাবেয়ি বলেছেন, আবু সাঈদ খুদরি (রা.) নামাজ পড়ছিলেন। তখন কুরাইশ গোত্রের এক যুবক তার সামনে দিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করল। তিনি তাকে বারবার থামানোর চেষ্টা করলেন। তিনবার বাধা দেওয়ার পরও সে সামনে দিয়ে হেঁটে গেল। তখন আবু সাঈদ (রা.) বললেন, “তুমি হয়তো ভাবছ, এতে নামাজ ভেঙে যায়। না, নামাজ ভাঙে না। কিন্তু নবীজি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, কেউ যদি নামাজরত ব্যক্তির সামনে দিয়ে যেতে চায়, তাকে থামাতে হবে। সে শয়তান। (কারণ, এমন কাজ শয়তান করে নামাজকে বিঘ্নিত করতে)।”^১

নাফি একটু চুপ হয়ে গেল। চোখেমুখে লজ্জার ছাপ ফুটে উঠল। সে বলল,

—আচ্ছা দোস্ত, আমি সত্যিই জানতাম না যে, এটা এত গুরুত্বপূর্ণ। রাগ করো না, প্লিজ!

রাইয়ান হেসে বলল,

—না রে দোস্ত, রাগ করিনি। তুমি যদি আমার সামনে দিয়ে হাঁটো, আমার নামাজ ভাঙবে না ঠিকই, কিন্তু এটা ভুল কাজ। এতে শয়তান খুশি হয়। আমি চাই না, আমার প্রিয় বন্ধু এমন কিছু করুক, যাতে শয়তান খুশি হয়।

নাফির চোখে একরকম লজ্জা ও ভালোবাসার ঝিলিক খেলে গেল।

সে বলল,

—তুমি ঠিক বলেছ বন্ধু। কাল থেকে আমি তোমাদের সঙ্গে নামাজে যাব। আর কখনো নামাজের সামনে দিয়ে হেঁটে যাব না—এই কথা দিলাম তোমাকে।

রাইয়ানের মুখে প্রশান্তির হাসি। সে মনে মনে বলল,

—কারও সঙ্গে ঝগড়া না করে, ভালোবাসা দিয়ে কেউ যদি আলোর পথ দেখাতে পারে, সেটাই আসল বিজয়।

শিক্ষা:

১. শয়তানকে খুশি করা যাবে না।

২. ভালোবাসা দিয়ে বোঝানো যায় এমন অনেক কিছু, যা রাগ বা ঝগড়ায় কখনো সম্ভব নয়। একজন বন্ধুকে সঠিক পথে ডাকা—এটাই তো সত্যিকারের বন্ধুত্ব!





আল্লাহর দোহাই

ঢাকার এক গরম দুপুর। সূর্য যেন আকাশ থেকে আগুন ঢেলে দিচ্ছে। মিরপুর ১১ নম্বর বাসস্ট্যান্ডে অনেক লোক দাঁড়িয়ে আছে। সবাই ঘামে ভিজে চপচপ করছে। এই সময়, একজন মাঝবয়সি লোক বাসের লাইনের সামনে এসে দাঁড়াল। হাতে পলিথিনে মোড়ানো কিছু ওষুধ। মুখে মাস্ক, চোখে চিন্তা আর ক্লান্তি। কিছু একটা খুঁজছে...। সে বলল,

“ভাই, আমি হাসপাতালে যাচ্ছি। মেয়ের জন্য ইনজেকশন আনতে হবে। আল্লাহর দোহাই দিয়ে বলছি, কেউ যদি ৫০০ টাকা সাহায্য করেন... বাকিটা আমার কাছে আছে।”

লোকজন চুপ। কেউ ফোনে ব্যস্ত, কেউ মুখ ফিরিয়ে নেয়। পাশে দাঁড়িয়ে এক তরুণ ফিসফিস করে বলে,

“এরা সব অভিনয় করে টাকা নেয়—প্রতারক।”

কিন্তু লাইনের এক পাশে দাঁড়িয়ে ছিল এক যুবক—এহতেশাম। তার মুখে সুন্দর দাড়ি, হাতে ব্যাগ। সে একটু থেমে লোকটির দিকে এগিয়ে গেল।

এহতেশাম জিজ্ঞেস করল,

“আপনি কি আল্লাহর নামে চাইলেন?”

লোকটি কাঁপা গলায় বলল,

“জি ভাই, আমি মিথ্যা বললে আল্লাহ যেন বিচার করেন।”

এহতেশাম মানিব্যাগ খুলে ৫০০ টাকা বের করে দিলো।

“এই নিন, মেয়েকে ঠিকভাবে চিকিৎসা করান। আল্লাহ ওকে সুস্থ করে তুলুন।”

লোকটির চোখে পানি চলে এলো।